ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা

অজয় রায়

*২২ মার্চ ২০১৮ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ২২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবসে **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা** শীর্ষক*
স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন গবেষক ও অধ্যাপক অজয় রায়

১৯৭১-এর মার্চে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলী ভুট্টো অপারেশন সার্চলাইট (Operation Searchlight) শুরু করেন যার উদ্দেশ্য হলো : পূর্ববংলার বাঙালিদের স্বাধীনতার দাবিকে চিরতরে ধ্বংস করে দেওয়া।

১৯৭১-এর ২৫ মার্চের কালরাত্রি

যে পাকিস্তানি আর্মি কনভয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণে অংশ নিয়েছিল তার মধ্যে ছিল ১৮ পাঞ্জাব, ২২ পাস্তুন, ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট। ভারি অস্ত্রে (ট্যাংক, স্বংয়ংক্রিয় রাইফেল, রকেট নিক্ষেপক, মর্টার, হাল্কা মেশিনগান) সজ্জিত হয়ে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয় চত্বরকে পূর্বদিক থেকে (ইউনিট ৪১), দক্ষিণ দিক থেকে (ইউনিট ৮৮) এবং উত্তর দিক থেকে (ইউনিট ২৬) ঘিরে ফেলে।

গণহারে শিক্ষক হত্যা

অপারেশন সার্চলাইট-এর শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দশ জন শিক্ষক নিহত হয়েছিলেন :
অধ্যাপক ফজলুর রহমান এবং তার দুই আত্মীয় নিহত হন; তিনি ছিলেন শিক্ষক আবাসন ভবনের ২৩ নম্বরে; সৌভাগ্যবশত বিদেশে থাকায় তাঁর স্ত্রী বেঁচে যান। পাকিস্তানি আর্মি অধ্যাপক আনোয়ার পাশা (বাংলা) ও রাশিদুল হাসানের (ইংরেজি) বাসাও আক্রমণ করে। তারা বিছানার তলায় আশ্রয় নেয়ায় বেঁচে গেলেও পরবর্তীকালে যুদ্ধের প্রায় শেষ অবস্থায় আলবদর বাহিনীর হাতে নিহত হন।

বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ছিলেন ২৪নং ভবনে। দুজন আহত মহিলা এই ভবনের সামনে কিছুক্ষণ ছিলেন। যখন আর্মি এল তারা সিড়িতে রক্ত দেখে ভাবলো অন্য আর্মি দল এ কাজটি করেছে এবং চলে গেল। এভাবে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বেঁচে গেলেন। পরে তিনি বলেছিলেন, এ ভবনে একজন পশ্চিম পাকিস্তানী অধ্যাপক ছিলেন, ২৫ মার্চের আগে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। অবাঙালি পরিবাররাও একই কাজ করেছিলেন কাউকে না জানিয়ে।

আর্মি সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষক আলি নকীর ২২নং ফুলার রোড ফ্লাটে প্রবেশ করে। তারা তাদের চলে যেতে দেয়, কিন্তু ভূতত্বের শিক্ষক একই ভবনের আবদুল মুকতাদিরকে হত্যা করে। তাঁর দেহ জহুরুল হক হলের ছাদে পাওয়া যায়। তাকে তার আত্মীয়রা পল্টনে কবর দেয়। ইংরেজির অধ্যাপক কে এম মুনীম ছিলেন সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক শিক্ষক। হলে সামান্য আহত হয়েছিলেন আর্মি দ্বারা। পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক এ আর খান খাদিম ও গণিতের প্রভাষক শরাফত আলী ঢাকা হলে আর্মি অ্যাকশনে নিহত হন। জগন্নাথ হল প্রভোস্টের আবাসের এলাকায় তারা অর্থনীতির অধ্যাপক মির্জা নূরুল হুদা ও ইতিহাসের অধ্যাপক মফিজুল্লাহ কবীরকে অপদস্থ করে।

যখন হিন্দু ছাত্রাবাস আক্রান্ত হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। জগন্নাথ হলের প্রাক্তন প্রভোস্ট প্রখ্যাত দার্শনিক গোবিন্দ চন্দ্র দেবকে তাঁর পালিত পুত্রসহ আর্মি হত্যা করে, মারাত্মকভাবে আহত করে বর্তমান প্রভোস্ট ও ইংরেজির অধ্যাপক ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে; তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়

এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন সম্ভবত ৩১ মার্চ। হাসপাতালের দুই নার্স তাকে চিনতে পেরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গের কাছে একটি গাছতলায় কবরস্থ করেন।

সহকারী আবাসিক শিক্ষক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য জগন্নাথ হলে নিহত হন। এই তথ্য নেয়া হয়েছে আনোয়ার পাশা লিখিত 'রাইফেল, রোটি আওরাত' উপন্যাস থেকে। অধ্যাপক আনোয়ার পাশা এই উপন্যাসটি লিখেছিলেন ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের অধিকৃত আমলে।

নৃশংস ছাত্রহত্যা

অসহযোগ আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ছত্রছায়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হল থেকে (সাবেক ইকবাল হল)। অপারেশন সার্চলাইটের প্রথম লক্ষ্যবস্তু বা টার্গেট ছিল ছাত্রাবাস বা হলগুলি। ২৫ মার্চের মধ্যরাতের মধ্যে ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ হল ছেড়ে চলে যায়। সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক শিক্ষক এবং ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শিক্ষক কে এম মুনীমের সাক্ষ্য অনুযায়ী এই হলে প্রায় ২০০ ছাত্র নিহত হয়।

মধ্যরাতের পর আর্মি জগন্নাথ হলে প্রবেশ করে শুরুতেই ছাত্রাবাসটি মর্টার দিয়ে আক্রমণ করে এবং বিরামহীনভাবে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। তারা হলটিতে উত্তর ও দক্ষিণের গেট দিয়ে প্রবেশ করে এবং নির্বিচারে প্রত্যেক রুমে ঢুকে ছাত্রদের হত্যা করতে থাকে। এই সময় মোটামুটি ৩৪ জন ছাত্র নিহত হয়। জগন্নাথ হলের কিছু ছাত্র রমনা কালীবাড়িতেও থাকতো। সেখানে ৫-৬ জন নিহত হয়। এদের মধ্যে কেবল রমণীমোহন ভট্টাচার্যের নাম জানা গেছে। ছাত্রদের অনেক অতিথিও সেদিন মৃত্যুবরণ করেন। যাদের মধ্যে ছিলেন ভৈরব কলেজের হেলাল, বাজিতপুর কলেজের বাবুল পাল, জগন্নাথ কলেজের বদ্‌রুদ্দোজা, জীবন শিকদার, মোস্তাক, নেত্রকোণার বাচ্চু এবং অমর।

আর্চার ব্লাড (Archer Blood) সে সময়কার ঢাকাস্থ ইউএস কনসাল জেনারেল, তাঁর *The Cruel Birth of Bangladesh* বইয়ে লিখেছেন, গোলাগুলি শুরু হয় মহিলা ছাত্রাবাস 'রোকেয়া হলে' এবং যখন ছাত্রীরা বের হয়ে আসতে চেষ্টা করছিল আর্মি গুলি শুরু করে। আর্মি এবং সামরিক নিয়ন্ত্রণ রুমের কথোপথন থেকে জানা যায় ৩০০ ছাত্রীর মধ্যে ৮৮ জন মারা গেছেন।

জগন্নাথ হলে নিহত ছাত্রদের তালিকা

উপেন্দ্র নাথ রায় : শেষ বর্ষ এমএস পদার্থবিদ্যা (গ্রাম গুলিয়ারা, দিনাজপুর)
কার্তিক শীল, শেষবর্ষ এমএ ইংরেজি (কাউখালি, বরিশাল)
কিশোরি মোহন সরকার: ১ম পর্ব ইংরেজি (পাড়াগ্রাম, ঢাকা)
কেশবচন্দ্র হাওলাদার: ১ম পর্ব গণিত (কাচাবালিয়া, বরিশাল)
গণপতি হালদার: ৩য় বর্ষ, রসায়ন (ঘাটিছড়া, বরিশাল)
জীবনকৃষ্ণ সরকার : শেষ পর্ব এমএস, রসায়ন (কুলপোটাক, ময়মনসিংহ)
ননীগোপাল ভৌমিক : ২য় বর্ষ (শ্যামগ্রাম, কুমিল্লা)
নির্মল কুমার রায় : ১ম পর্ব এম.কম (?)
নিরঞ্জন প্রসাদ সাহা : ১ম পর্ব এম.এসসি পদার্থবিদ্যা (?)
নিরঞ্জন হালদার : শেষপর্ব এমএস পদার্থবিদ্যা (শিখাপুর, বরিশাল)
প্রদীপ নারায়ণ রায় চৌধুরী : ১ম পর্ব এমএ
বরদা কান্ত তরফদার : ২য় বর্ষ, খেপামল, ময়মনসিংহ)
বিধান চন্দ্র ঘোষ : ৩য় বর্ষ ইংরেজি (কাচিরাপারা, পাবনা)
বিমল চন্দ্র রায় : ৩য় বর্ষ পরিসংখ্যান (বালিরটেক, মানিকগঞ্জ)
মুরারী মোহন বিশ্বাস : এমএড (একতারপুর, কুষ্টিয়া)

মৃণাল কান্তি বোস : শেষপর্ব অর্থনীতি (মুরিয়াগোরা, ফরিদপুর)
মনোরঞ্জন বিশ্বাস : ২য় বর্ষ, গণিত (সাতপার, ফরিদপুর)
রণদা প্রসাদ রায় ; ২য় বর্ষ গণিত (কসবা, ফরিদপুর)
রমনীমোহন ভট্টাচার্য্য : ১ম পর্ব এমএ, দর্শন (অষ্টগ্রাম, ময়মনসিংহ)
রাখাল রায় : ৩য় বর্ষ গণিত (চণ্ডীপুর, কুমিল্লা)
শিবকুমার দাস : ২য় বর্ষ মৃত্তিকা বিজ্ঞান (পাটুয়ারি, ফরিদপুর)
রূপেন্দ্র নাথ সেন : ২য় বর্ষ রসায়ন (ভাঙ্গা, ফরিদপুর)
সন্তোষ চন্দ্র চৌধুরী : শেষ পর্ব উদ্ভিদবিদ্যা (বড়িবারি, ঢাকা)
শিশুতোষ দত্ত চৌধুরী : ২য় বর্ষ ইংরেজি (অম্বর, সিলেট)
সত্যরঞ্জন দাশ : ৩য় বর্ষ রসায়ন (বজোনবা, ঢাকা)
সুজিত দত্ত : ৩য় বর্ষ (?) (পলাশ, ঢাকা)
সুভাষ চন্দ্র চক্রবর্তী : ২য় বর্ষ পরিসংখ্যান (ময়মনসিংহ)
সুশীল চন্দ্র দাশ: ৩য় বর্ষ, মৃত্তিকা বিজ্ঞান (বরাইল, কুমিল্লা)
স্বপন চৌধুরী : ৩য় বর্ষ, পরিসংখ্যান (ঢেমলা, চট্টগ্রাম)
হরিনারায়ণ দাশ : ৩য় বর্ষ সমাজবিদ্যা (নরসিংদি, ঢাকা)
অজিত রায় চৌধুরী : কোন তথ্য পাওয়া যায় নি
নিরঞ্জন চন্দ : কোন তথ্য নেই
প্রবীর পাল : ১ম পর্ব এমএস (?) (আমলাপাড়া, ময়মনসিংহ)
ভবতোষ ভৌমিক : ২য় বর্ষ এমএস রসায়ন (চাঁদপুর)
সত্যরঞ্জন নাগ :
সুব্রত সাহা :

জগন্নাথ হলে নিহত কর্মচারী ও অতিথিদের তালিকা

মধুসূদন দেব (জনপ্রিয়ভাবে পরিচিত মধুদা)
খগেন্দ্র চন্দ্র দেব : দর্শন বিভাগের কর্মচারী (গ্রন্থাগারের সহায়তাকারী)
সুশীল চন্দ্র দেব: জলের পাম্পের মিস্ত্রি, প্রকৌশল বিভাগ
মতিলাল দেব : তথ্য পাওয়া যায়নি
দাশুরাম : ফুল বাগানের মালী, উপাচার্যের বাসভবন
মন ভরন রায় : নিপা অফিসের কর্মচারী
রাজ ভরন : ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, প্রকৌশল বিভাগ, ঢা.বি
প্রিয়নাথ রায় : দারোয়ান
সুনীল চন্দ্র দাস (সুইপার)
দুখিরাম মণ্ডল (সুইপার)
শিবপদ কুরি (সুইপার)
রাজেন ব্রহ্মচারী, শিববাড়ি মন্দিরের আধ্যাত্মিক গুরু
সরোজ ব্রহ্মচারী : শিববাড়ি মন্দিরের আধ্যাত্মিক গুরু
মাধব চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী : শিববাড়ি মন্দিরের আধ্যাত্মিক গুরু
রাম ধোনী ব্রহ্মচারী : শিববাড়ি মন্দিরের আধ্যাত্মিক গুরু
স্বামী মুকুন্দ নন্দ সরস্বতী : শিববাড়ি মন্দিরের আধ্যাত্মিক গুরু

জহর লাল রাজভরন, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের মালি
ভীম রায়
বোধি রাম
মনি রাম

কর্মচারী হত্যা

যে মিলিটারি কনভয়টি জহুরুল হক হল আক্রমণের লক্ষ্য করেছিল তারা প্রথমে ব্রিটিশ কাউন্সিল ভবন প্রহরায় নিযুক্ত কতিপয় ইপিআর (EPR : East Pakistan Rifles) সদস্যকে হত্যা করে। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের ৪র্থ শ্রেণির কতিপয় কর্মচারীকে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে : এরা হলেন- সিরাজুল হক, আলী হোসেন, সোহরাব আলি গাজী এবং আবদুল মজিদ। রোকেয়া হলে ছত্তার, আহমদ আলি, আবদুল খালেক, নোমি, মো: সোলায়মান খান, মো: নুরুল ইসলাম, মো: হাফিজউদ্দিন, মো: চুন্নু মিঞা প্রমুখকে তাদের পরিবারের সদস্যসহ হত্যা করে।

যে সামরিক কনভয় শহীদ মিনার ও বাংলা একাডেমি আক্রমণ করে তারাই শহীদুল্লাহ হলের (সাবেক ঢাকা হল) যে অংশটিতে শিক্ষকদের আবাসিক ভবন রয়েছে তা এবং মধুসূদন দে'র আবাসভবন আক্রমণ করে। ফুলার রোডে অবস্থিত ১১নং ভবনের একতলায় বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষক নিহত হয় আর্মি আক্রমণে। আর্মি প্রায় ৫০ জনের লাশ ফেলে যায়, এর মধ্যে রয়েছে রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে পলাতক পুলিশ অফিসার, বাঙালি ইপিআর সদস্য, যারা বঙ্গভবনে প্রহরারত ছিল; এছাড়া নীলক্ষেত বস্তিবাসী অনেকেই নিহত হয়। অনেকেই বস্তি ছেড়ে শিক্ষকদের ভবনের ছাদে আশ্রয় নিয়েছিল।

২৫ এবং ২৬ মার্চে (১৯৭১) পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তিনটি মন্দির ধ্বংস-সাধন করে, এর মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন শিখদের পবিত্র উপাসনালয় 'গুরুদুয়ারা', রমনা কালী মন্দির এবং শহিদ মিনারের বিপরীতে অবস্থিত রমনা শিবমন্দির। এছাড়া ইতিপূর্বে উল্লেখিত খগেন দে, তার ছেলে মতিলাল দে, সুশীল চন্দ্র দে, বোধিরাম, দুখিরাম, ভীমরাম, মনিরাম, জহরলাল রাজভরন, মনভরন রায়, পনির মিস্ত্রী এবং শংকর কুরি প্রমুখ ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিদের নিহতের কথা বলা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাস বা ছাত্রী হলে আক্রমণ

সে সময়ে ঢাকায় কর্মরত ইউএস কনসাল জেনারেল আর্চার কে. ব্লাড তাঁর 'বাংলাদেশের নিষ্ঠুর জন্মকথা' বা 'Cruel Birth of Bangladesh' গ্রন্থে লিখেছেন, "গোলাগুলি শুরু হয় মেয়েদের ছাত্রীনিবাস রোকেয়া হল থেকেই এবং যখন ছাত্রীরা পালাবার উপক্রম করছিল, সামরিক বাহিনী তাদের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। ১৯৭১-এর ১০ নভেম্বর একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত রোকেয়া হল আক্রমণ করে এবং দুই ঘণ্টা ধরে ৩০ জন ছাত্রীকে আটকে রাখে। সামরিক বাহিনীর এই সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষের (Provost) বাসাও আক্রমণ করে।" ১৯৭১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সামরিক অভিযানকালে রোকেয়া হলের নিকটবর্তী দুটি শক্তিশালী সামরিক অবস্থান-কেন্দ্র (Establishment) বা ছাউনি ছিল। কাজেই তাদের অজ্ঞাতে বা অনুমোদন ব্যতিরেকে এ ধরনের দুর্বৃত্তিক আক্রমণ পরিচালনা অসম্ভব। কল্যাণ চৌধুরীর লেখা 'বাংলাদেশে গণহত্যা (Genocide in Bangladesh)' বইয়ে সারমর্মে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালে অক্টোবরে পাঁচ জন সৈন্য নিয়ে মেজর আলম ছাত্রী-নিবাসটি প্রথমে পরিদর্শন করেন এবং হল সুপারিনটেন্টডেন্টকে অনুরোধ করেন কতিপয় ছাত্রী সরবরাহ করতে যারা তেজগাঁও ক্যান্টমেন্টের বিচিত্রানুষ্ঠানে নাচ ও গান পরিবেশন করতে পারে। হল সুপারিনটেন্টডেন্ট জানান যে, বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় অধিকাংশ

ছাত্রী হল ত্যাগ করে চলে গেছে, মাত্র ৪০ জন রয়েছে ; কিন্তু হলের সুপার হিসেবে তিনি এ জন্য মেয়েদের ক্যান্টনমেন্টে যেতে দিতে পারেন না। ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট মেজর আলম চলে যান। এর পরই মেজর আলমের মিশনটির কথা সুপার টেলিফোনে ক্যান্টনমেন্টে উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে জানান। যাই হোক, সে দিনই রাত ৮টার দিকে মেজর আলম এবং তার সহগামী সেপাইরা রোকেয়া হল আক্রমণ করে। বর্বররা ছাত্রীদের প্রতিটি কক্ষের দরজা ভেঙে প্রবেশ করে, তাদের টেনে বের করে, বিবস্ত্র করে অসহায় সুপারের সামনেই বলাৎকার করে। সমগ্র কুৎসিত ব্যাপারটি এমন জঘন্য পরিবেশে প্রকাশ্যে করা হয় যে এমন কি করাচির পত্রিকা 'ডন' সামরিক নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ঘটনার বিশদ বিবরণ প্রকাশ করে।

স্বাধীনতার সাত দিন পরেই ঢাকা ও এর আশপাশ থেকে ৩০০ রমণী উদ্ধার করা হয়। তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পাকিস্তানি সেনা আর অফিসারদের লালসা চরিতার্থে। ২৬ ডিসেম্বর সর্বমোট ৫৫জনকে কাহিল ও অর্ধমৃত অবস্থায় রেডক্রশ, মুক্তিবাহিনীর ও মিত্রবাহিনীর সহায়তায় বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়, তারা পাকসেনাদের হাতে বন্দী ও নিগৃহীত হয়েছিল; এর মধ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টসহ দেশের ছোটখাটো শহরও ছিল।"

১৯৭১-এ অধিকৃত পূর্ব পাকিস্তানে একাডেমিক কার্যক্রম

গভর্নর টিক্কা খান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সকল বিভাগীয় প্রধানদের ২১ এপ্রিলের মধ্যে স্ব স্ব কাজে যোগদানের নির্দেশ দেন এবং অন্যান্য শিক্ষকদের অবশ্যই ১ জুনের মধ্যে। তার এই নির্দেশ মতো ক্লাশ অবশ্যই শুরু হতে হবে ২ আগস্ট থেকে। আর্মি কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত বিশ্ববিদ্যলয় ভবন, শ্রেণি কক্ষ, লাইব্রেরি বা ল্যাবরেটরি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ; এসব প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস, ক্ষয়ক্ষতি ও নিশ্চিহ্নকরণের সকল চিহ্ন ও কর্মতৎপরতা অবলোপন, যেন কিছুই হয়নি– সবই স্বাভাবিক ছিল, এমন দৃশ্য সৃষ্টি করার নির্দেশ দেওয়া হয় আন্তর্জাতিক বিশ্বের বিবেককে ধোকা দিতে। বোঝানোর চেষ্টা হয় যেন একাডেমিক পরিবেশ ঢাকাসহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাজমান ছিল। জাতীয় সঙ্কটের কারণে সকল স্তরের পরীক্ষা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থগিত করা হয়েছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল শ্রেণিতে ছাত্র উপস্থিতি ছিল প্রায় শূন্য। এটি মজার ব্যাপার ও চিত্তাকর্ষক যে যুদ্ধের তীব্রতা যতই বাড়ছিল শ্রেণি কক্ষে ছাত্র উপস্থিতি বাড়ছিল; এটি সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এর কারণ হলো যেহেতু বহুসংখ্যক ছাত্র মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি কোন পাক সামরিক জান্তার লক্ষ্য অভিমুখে গ্রেনেড ছুঁড়ে দ্রুত ক্লাশে ঢুকে পড়তো। এ কারণে কোন গেরিলাকে আর্মি ধরতে পারতো না।

শিক্ষকদের সতর্কীকরণ, গ্রেপ্তার এবং শাস্তিপ্রদান

মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি, মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জ্ঞাত সম্পর্ক ও সংযোগ যে সব শিক্ষকের রয়েছে গভর্নর টিক্কা খান তেমন বেশ কিছু শিক্ষকদের নামে গ্রেফতারি পরোয়না ইস্যু করেছিলেন, এমন কি বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করিয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন ইতিহাস বিভাগের ড. আবুল খায়ের (রিডার), আহসানুল হক (ইংরেজি বিভাগের সিনিয়র লেকচারার); তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ (ইতিহাস বিভাগের সিনিয়র লেকচারার), রফিকুল ইসলাম (বাংলা বিভাগের সিনিয়র লেকচারার), এ এম এম শহীদুল্যা (গণিতের সিনিয়র লেকচারার), কে এ এম সাদউদ্দিন (সমাজতত্ত্ব বিভাগের সিনিয়র লেকচারার), জহুরুল হক (দর্শন বিভাগের লেকচারার)। প্রদেশের গভর্নর ও সামরিক প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান সরকারি ও লিখিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কয়েকজন খ্যাতিমান

শিক্ষককে তাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার পক্ষে কর্মতৎপরতার জন্য সাবধান করে দেন তাঁরা হলেন– মুনীর চৌধুরী (বাংলা বিভাগের রিডার), অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিম (বাংলা বিভাগের অধ্যাপক), সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (ইংরেজি বিভাগের রিডার) এবং খ্যাতনামা ভাষাবিজ্ঞনী ড. এনামুল হক (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অধ্যাপক), অধ্যাপক ড. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহকে (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক) বরখাস্ত করা হয়। রাজনীতি-বিজ্ঞান ও দর্শণের প্রবীণ শিক্ষক আবদুর রাজ্জাককে মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সমর্থন করার অপরাধে (!) টিক্কা খান-সরকার তার অনুপস্থিতে ১৪ বছর কারাদণ্ড দিয়েছিল। তিনি অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস নিজ গ্রামে অজ্ঞাতবাসে থেকে স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেছেন। তিনি স্বাধীনতা-উত্তর কালে জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

১৯৭১-এ সামরিক জান্তা শাসনামলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

ঢাকা শহর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের আর্মি ক্র্যাকডাউনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন উপাচার্য ছিলেন না। মার্চের প্রথম দিকে তদানীন্তন উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ছিলেন জেনেভাতে– সেখানে তিনি জাতিসংঘের মানবতাবাধিকার সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছিলেন। মার্চের মাঝামাঝি সময়ে তিনি সংবাদপত্রে ছাত্রের মৃত্যুর খবর পাঠ করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ঢাকাস্থ সচিবালয়ে শিক্ষা-সচিবের উদ্দেশ্যে তার পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেন এবং সম্মেলন ছেড়ে লন্ডনের উদ্দেশে জেনেভা ত্যাগ করেন। সেখানে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করেন এবং লণ্ডনকে ভিত্তি করে পাশ্চাত্যে বাংলাদেশ আন্দোলন পরিচালিত করেন। তিনি সেখানে প্রবাসী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অধীনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেন। স্বাধীনতার পর তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন।

এদিকে অধিকৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তখনকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনকে উপাচার্য নিযুক্ত করেন ঢাকার সামরিক জান্তা। বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাজশাহী এবং ঢাকা) যে সব শিক্ষক পাক-প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রশাসনকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেন তাদের মধ্যে ছিলেন- রাজনীতি বিভাগের ড. হাসান জামান, ইতিহাসের ড. মোহর আলী, গণিতের এ কে এম আবদুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুল বারি (আরবি), ড. মকবুল হেসেন (পদার্থবিদ্যা), ড. সফিউদ্দিন জোয়ারদার (ইতিহাস) প্রমুখ। স্বাধীনতার পর যে সব ব্যক্তি পাকিস্তানিদের সহযোগিতা করার জন্য অভিযুক্ত হন তাদের অনেকেই বিচারের সম্মুখীন হন। বিভিন্ন কোলাবোরেটরদের সাথে গ্রেফতার হন উপচার্য ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, ড. হাসান জামান এবং ড. মোহর আলী।

পাকবাহিনী ও তাদের সহযোগী কর্তৃক ১৪ ডিসেম্বরের হত্যাকাণ্ড

১৯৭১-এর ডিসেম্বরের শুরুতে পাক সরকার এবং পাকবাহিনীর কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে পাকিস্তান যুদ্ধে হেরে যাবে। যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবার খুললো ২ জুলাই ১৯৭১, যে সব শিক্ষক পাক জান্তার সাথে কোলাবোরেট/সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল তারা আবদুল গণি রোডে পাকিস্তানী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে এক বৈঠক করে : উদ্দেশ্য যে সব শিক্ষক স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেছে তাদের একটি তালিকা তৈরি করে পাক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া, যাতে তাদের হত্যা করা যায়। সে সময় পাকিস্তানী বাহিনী একদল প্যারামিলিটারি বাহিনী গড়ে তোলে, এরা বিভিন্ন নামে অভিহিত হতো কাজের উদ্দেশ্য বুঝে, যেমন- রাজাকার, আলবদর, আলশামস। যে সব ছাত্র ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য ছিল তারা হলো আলবদর। ডিসেম্বরে যুদ্ধের শেষলগ্নে আলবদর

বাহিনী গোপনে নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী এবং বেশ কিছু বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে। এদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু নামকরা অধ্যাপক ছিলেন।

'গণহত্যা' পদটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে

১৯৪৪ সালের আগে 'গণহত্যা' শব্দটির কোন অস্তিত্ব ছিল না। এটি একটি বিশিষ্ট অর্থবাহী পদ বা শব্দ। এই পদটি দিয়ে বোঝান হয় এমন ভয়াবহ অপরাধ (Crime) যা কোন মানবগোষ্ঠী, সম্প্রদায়, জাতি বা এথনিক গ্রুপকে নিশ্চিহ্ন বা অবলুপ্ত করে ফেলার উদ্দেশে পরিচালিত হয়। জাতিসংঘ সংঘবদ্ধ বা লিপিবদ্ধ মানবাধিকার অথবা ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘ গৃহীত মানবাধিকার ঘোষণা, প্রতিটি ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠায় সতত উদ্বিগ্ন ও জাগ্রত।

১৯৪৪ সালে পোলান্ডবাসী রাফেল লেমকিন (Raphael Lemkin) জার্মানি এবং পোলান্ডের অর্থাৎ ইউরোপীয় ইহুদীর বিরুদ্ধে নাজি জার্মানির গৃহীত শৃংখলিত ব্যবস্থাপনা বা পলিসির মধ্য দিয়ে ইহুদী জাতিকে ধ্বংস করা বোঝাতে এই শব্দ ব্যবহার করেন। এ সবের মধ্যে রয়েছে শৃঙ্খলিত পন্থায় হত্যা যাতে ইউরোপীয় ইহুদীদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলা যায়। তিনি ইহুদীদের বিরুদ্ধে এই নানা ধরনের ধ্বংসাত্মক ও নৃশংস কর্মপন্থা চালিত পদ্ধতি একটি শব্দে বর্ণনা করেছেন। শব্দটি হলো গণহত্যা বা জেনোসাইড (genocide)। তিনি এই পদটি দুটি শব্দ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন– একটি হল গ্রিক শব্দ 'জেনো' (*geno*) যার অর্থ হলো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী বা রেস। আর অন্য শব্দটির উৎস হলো ল্যাটিন 'সাইড' (*-cide*) যার অর্থ হলো 'হত্যা' (killing)। একটি জাতি বা মানবগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করার উদ্দেশেই অত্যচারী ও শাসক গোষ্ঠী নানা পন্থা ও কৌশল উদ্ভাবন করে ঐ জাতিটিকে নির্মূল করতে প্রয়াস পায়। এই উদ্দেশ্যপূর্ণ নৃশংস ও নির্মম হত্যা প্রক্রিয়াকেই জেনোসাইড (genocide) বোঝাতে চেয়েছেন লেমকিন।

পরের বছর, জার্মানির নুরেমবার্গ শহরে আন্তর্জাতিক সামরিক বিচারালয় (International Military Tribunal) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই আদালত 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ'-এর জন্য বড় বড় নাজি নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগনামা (chargesheet) পেশ করে। গণহত্যা 'শব্দটি' অভিযোগ পত্রে ব্যবহৃত হলেও এটি বর্ণনাদায়ী পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, আইনসিদ্ধ পদ (not legal) হিসেবে নয়।

গণহত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধ (THE CRIME OF GENOCIDE)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালের নির্মম হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতার ছায়ায় স্বয়ং লেমকিনের অক্লান্ত চেষ্টায়, ১৯৪৮-এর ৯ ডিসেম্বর তারিখে গণহত্যা সংশ্লিষ্ট অপরাধ নিবারণ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের শাস্তিদান বিষয়ক ঘোষণা জাতিসংঘ অনুমোদন দেয়। এই সম্মেলনে আন্তর্জাতিক অপরাধ রূপে 'গণহত্যা' স্বীকৃতি পায় এবং স্বাক্ষরদাতা দেশগুলি দায়িত্ব নেয় এর 'প্রতিহতকরণ ও শাস্তি প্রদান' (undertake to prevent and punish) নিশ্চিত করতে। সম্মেলন নীচে বর্ণিত পদ্ধতিতে গণহত্যার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে:

গণহত্যার অর্থ হলো একটি জাতিগোষ্ঠী, নৃতাত্বিক, বর্ণগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিলোপ করার লক্ষ্যে নীচে বর্ণিত পন্থা (সমূহ) গ্রহণ বা সাধিত হলে :

(ক) গোষ্ঠীটির সদস্যদের হত্যা করা;

(খ) গোষ্ঠী-সদস্যদের শারীরিকভাবে বা মানসিকভাবে ক্ষতিসাধন করা;

(গ) ইচ্ছাকৃতভাবে এমন জীবনধারনের অবস্থা সৃষ্টি করা যাতে গ্রুপ সদস্যদের সম্পূর্ণ বা আংশিক শারীরিক ক্ষতিসাধন হয়;

(ঘ) প্রশাসনে সমাজে বা রাষ্ট্রে এমন কিছু উপায় গোষ্ঠী-সদস্যদের ওপর আরোপ করা যাতে গোষ্ঠীর জন্মবৃদ্ধি ঘটে না;
(ঙ) একটি গোষ্ঠীভুক্ত শিশুদের অন্য কোন গোষ্ঠীতে স্থানান্তর করা।

যদিও ইতিহাসের নানা পর্বে কালে কালে কোন জনগোষ্ঠী অভিলক্ষ্যে চালিত সন্ত্রাস ঘটেছে এবং যখন থেকে ঘোষণা কার্যকর হয়েছে, পদটির আইনসিদ্ধতা এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দুটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্বে নিবদ্ধ হয়েছে: যে সময় থেকে পদটি চয়িত হয়েছে তখন থেকে আন্তর্জাতিক আইন রূপে (১৯৪৮)-এর স্বীকৃতি এবং আন্তর্জাতিক এবং জেনোসাইড সম্পৃক্ত অপরাধ বিচারের উদ্দেশে স্থাপিত আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারালয় স্থাপন হয়েছে। গণহত্যা নিবারণ ঘোষণার অন্যতম মুখ্য দায়িত্ব হলেও এখনও সমগ্র মানব জাতি এবং ব্যক্তির কাছে তা চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়েছে।